অবতরণিকা
Introduction

১

যেকোনো সংগঠনকে সচল রাখার জন্য যে উপাদান দুটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো মানুষ এবং তার আচরণ। তাই সংগঠনে মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তাদের আচরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু মানুষ উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত অন্যান্য উপাদানের ন্যায় শুধুমাত্র উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র নয়, তাই তার স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিসত্ত্বা ও অন্যান্য মানবীয় অভিপ্রায় সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। সাংগঠনিক আচরণ এ ব্যাপারে মানবিক আচরণের মূলনীতিগুলোকে সমস্যা নিরসনের কাজে প্রয়োগ করে। ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে কর্মী পর্যন্ত সবাই সংগঠনের নির্ধারিত আওতার মধ্যে অবস্থান করে। নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও একে অপরের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ জন্য সংগঠনে সবার একে অপরের আচরণ সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। এ ধারণা অর্জনের জন্য এ ইউনিটে সংগঠন এবং সংগঠনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে আসুন, ইউনিটটি শেষ করে আমরা সংগঠন ও সাংগঠনিক আচরণ সম্পর্কে জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১: সংগঠন ও আচরণ

পাঠ - ২: সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক ধারণাসমূহ

পাঠ - ৩: ব্যবস্থাপকীয় ভূমিকা, দক্ষতা ও কার্যাবলি

পাঠ ১.১ সংগঠন ও আচরণ
Organization and Behavior

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠন কী তা বলতে পারবেন।
- সংগঠনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আচরণ ও সাংগঠনিক আচরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সাংগঠনিক আচরণ হলো আচরণ সম্পর্কিত বিদ্যা ও অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র। এটি অধ্যয়নে দেখা যায়, সামাজিক ভাবেই মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্থ। এ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন সংগঠিত সমাজব্যবস্থা। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় মানুষের সব উদ্যম, উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড কোনো না কোনো ধরনের সাংগঠনিক পরিবেশের মধ্যেই পরিচালিত হয়। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু, কর্মজীবন, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি সাংগঠনিক পরিবেশের মধ্যেই আবর্তিত। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এ্যামিটাই এটজিয়নী (Amitai Etzioni) -এর বিখ্যাত উক্তি ''We are born in organizations, educated by organizations, and most of us spared much of our lives working for organizations.''

যদি তাই হয়, সাংগঠনিক পর্যায়ে মানবিক আচরণ অনুধাবন করার কোনো বিকল্প নেই। সাংগঠনিক পর্যায়ে মানুষ যে আচরণ করে তার সাথে সামাজিক আচরণের অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সংগঠনে একজন ব্যক্তি কীভাবে ও কেন নির্দিষ্ট আচরণ করে এবং এর পেছনে কী যুক্তি বা শক্তি ক্রিয়াশীল তা জানা আবশ্যক।

কেউ কেউ 'organizing' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংগঠন' শব্দ ব্যবহার করেন। ব্যাকরণীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিশব্দ 'সংগঠিতকরণ' হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'organization' শব্দের অর্থ- 'সংগঠন'। এ বইয়ে মূলত 'সংগঠন' শব্দটি ব্যবহার করলেও সংগঠিতকরণ শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহার করা হবে।

সংগঠন কী?
What is Organization?

প্রারম্ভেই বলা হয়েছে সংগঠনের সাথে মানুষ কীভাবে জড়িত। সাংগঠনিক আচরণ বুঝতে হলে প্রথমেই 'সংগঠন' এবং 'আচরণ' কে বুঝতে হবে। সাধারণত: সংগঠন বলতে মানুষের যে কোনো ঐক্যবদ্ধ কর্ম প্রয়াসকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে সংগঠনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কেউ কেউ সংগঠনকে একটি সামাজিক একক (Social Unit), আবার কেউ একে সামাজিক ব্যবস্থা (Social System) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, মানুষ যখন এককভাবে কোনো জটিল কাজ নিজে সম্পাদন করতে পারেনা তখন অপরের সাহায্যে তা সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়। এভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কতিপয় সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেরা সংগঠিত হয় এবং সৃষ্টি করে সংগঠনের।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স এবং থিওডর ক্যাপলো নিম্নোক্তভাবে সংগঠনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন:

- ''সংগঠন হলো একটি সামাজিক একক যা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ইচ্ছাকৃতভাবে গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়''। [Organizations are social units of human groupings deliberately constructed and reconstructed to seek specific goals.] - **Talcott Parsons**
- ''সংগঠন হলো একটি সামাজিক ব্যবস্থা যা কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়।'' [An organization is a social system deliberately established to carry out some definite purpose.] - **Theodore Caplow**

এ দুটো সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংগঠন হলো একটি লক্ষ্য অভিমুখী, পরিকল্পিত ও ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সত্তা যা একক বা দলীয় উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং সংগঠনকে মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যেকোনো ঐক্যবদ্ধ মানবীয় প্রচেষ্টা বা প্রয়াস হিসেবে অভিহিত করা যায়।

সংগঠনের প্রকারভেদ

Types of Organization

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, সংগঠন কীভাবে মানুষের আচরণে প্রভাব বিস্তার করে। সংগঠনের ধরন অনুযায়ী মানুষের আচরণেও পরিবর্তন আসে। সাধারণত: সংগঠনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়-

১. আনুষ্ঠানিক সংগঠন
২. অনানুষ্ঠানিক সংগঠন

১. আনুষ্ঠানিক সংগঠন

Formal Organization

বস্তুতঃপক্ষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই এক একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় প্রশাসক/ব্যবস্থাপকেরা আনুষ্ঠানিক সংগঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। তারাই প্রতিষ্ঠানের ভিশন, মিশন, কৌশলিক পরিকল্পনা, পলিসি ও কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণ করার পাশাপাশি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করেন। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন প্রতিবিম্বিত হয়। আনুষ্ঠানিক সংগঠনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ ও সংজ্ঞায়িত করে দেয়া হয়:

ক. কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক
খ. কে কার নিকট জবাবদিহি করবে তার রূপরেখা
গ. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ চ্যানেল কিরূপ হবে তা সম্পর্কিত নিয়মাবলী
ঘ. কর্তৃত্বের স্তর।

আনুষ্ঠানিক সংগঠনের সবাইকে নির্ধারিত দায়িত্ব অবধারিতভাবে পালন করতে হয়। দায়িত্বে অবহেলার জন্য শাস্তির বিধান থাকে।

২. অনানুষ্ঠানিক সংগঠন

Informal Organization

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শৃংখলা ও কর্তৃত্বের স্তর সৃষ্টির জন্য আনুষ্ঠানিক সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। তবে আনুষ্ঠানিক সংগঠনের ভেতরেও অনেক না-বলা-কথা থেকে যায় যা সাংগঠনিক কাঠামো থেকে অনুধাবন করা যায় না। আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বাইরেও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে - কথাবার্তা বলে, তথ্য বিনিময় করে, বন্ধুত্ব তৈরি করে। তাই আনুষ্ঠানিক সংগঠনের আওতার মধ্যে থেকেই মানবীয় আচরণ বিবেচনা করতে হবে।

বিভিন্ন স্বার্থের কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে। এরূপ দল মনে মনে গড়ে তোলা হয়- লিখিতভাবে এর প্রকাশ থাকে না। এরূপ দল অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের জন্ম দেয়। আনুষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে থেকেই

অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কর্মচারী দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনকালে বিভিন্ন কর্মীর সাথে মেশার সময়, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়, চা খাবার অবসরে কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। যখন অনেক লোক একই স্থানে একত্রে মিলেমিশে কাজ করে তখন সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কই হলো অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের ভিত্তি। অনানুষ্ঠানিক সংগঠন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি নেটওয়ার্ক। এরূপ সম্পর্কের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলে।

আচরণ কী?

What is Behavior?

আচরণ হলো আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ, মানুষ যেসব কাজ করে সেসব কাজ বা ক্রিয়াই হলো আচরণ। যেমন- মানুষ হাত নাড়ে, ঘুমায়, কথা বলে, ইত্যাদি কাজই তার এক একটি আচরণ। মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সে উদ্দীপকের প্রতি সাড়া প্রদানে সক্ষম। আচরণ হলো বিশেষ কোনো উদ্দীপকের প্রতি প্রাণী বা মানুষের সাড়া প্রদান। উদ্দীপকের প্রতি মানুষের এ সাড়া প্রদানকে প্রত্যুত্তর বা প্রতিক্রিয়া বলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আচরণকে প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক রুপ বা প্রত্যুত্তরের সমষ্টি বলা যেতে পারে।

মানুষ কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেতনভাবে উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়। এ অর্জন করার সক্রিয় প্রচেষ্টার মধ্যেই আমরা ব্যক্তির আচরণ প্রত্যক্ষ করে থাকি। অবশ্য উদ্দেশ্যমুখী আচরণ ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ (perception) ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষণ হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তির উপলব্ধিজনিত জ্ঞান যার মাধ্যমে ব্যক্তি চতুর্পার্শ্বস্থ পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ হয় । প্রত্যক্ষণ একটি ব্যক্তিগত অনুভব প্রক্রিয়া। এ কারণে এক ব্যক্তির আচরণের সাথে আরেক ব্যক্তির আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আমরা ইউনিট ৩- এ আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো। মানুষের আচরণের ভিন্নতা দুই ধরনের উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়-

১. ব্যক্তিগত উপাদান
২. পরিবেশগত উপাদান

ব্যক্তির স্বাভাবিক আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, প্রেষণা, বয়স, লিঙ্গ, মূল্যবোধ, মনোভাব, ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে, Physical conditions, সাংগঠনিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশগত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আচরণ হলো ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের মধ্যে সংঘটিত মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল। এ দুই উপাদানের তারতম্যের কারণে মানুষের আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

মানুষ উদ্দেশ্যমুখী আচরণ করলেও প্রায়শই তার আচরণের কারণ সে জানেনা। এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়না। মানুষ তার অবচেতন মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে। অবচেতন মন আমাদের অবদমিত ইচ্ছা পূরণের এক স্বপ্ন ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে বিধায় আচরণে অবচেতন মনের প্রভাব পড়ে। সুতরাং, উদ্দীপক ও ব্যক্তির মধ্যে সংঘঠিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে আচরণের সৃষ্টি হলেও মানুষের আচরণের পেছনে অবচেতন মনের প্রভাবও যথেষ্ট।

সংগঠন এবং আচরণ সম্পর্কে জানা হলো। তাহলে এবার আসুন সাংগঠনিক আচরণ সম্পর্কে জেনে নিই।

সাংগঠনিক আচরণের অর্থ

Meaning of Organization Behavior

আচরণ বিজ্ঞানের (Behavioral Science) শাখা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তার মধ্যে সাংগঠনিক আচরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে সংগঠনে মানবিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ দিক থেকে একে মানবিক আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা হয়। সাংগঠনিক আচরণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আস্থা, কর্মতৃপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়। প্রতিষ্ঠান কোনো পণ্য তৈরি করার জন্য বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে, যেমন- যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, নগদ অর্থ ইত্যাদি। কিন্তু এ উপাদানগুলো

মানুষের ছোঁয়া না পেলে কোনো দ্রব্যে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক কার্য সম্পাদন নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মানবিক সম্পর্কের উপর।

মানবিক সম্পর্ক বলতে একদিকে যেমন শ্রমিক-ব্যবস্থাপক-মালিক সম্পর্ককে বুঝায় তেমনি শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিক-কর্মীদের আচরণের ধরন ও প্রকৃতি, তাদের প্রত্যাশা, আবেগ, নৈরাশ্য ও আনন্দ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মৌলিক কারণ জানা আবশ্যক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় - ''সাংগঠনিক আচরণ কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানের অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগকে বুঝায়।''

আসুন, সাংগঠনিক আচরণের বহুল ব্যবহৃত দুইটি সংজ্ঞা জেনে নিইঃ

''Organization behavior is a field of study that investigates the impact of individuals, groups and structure on behavior within organizations for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness.'' – **Stephen P. Robbins**

''Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people act and behave within organizations.'' – **Davis and Newstorm**

সংজ্ঞা দুইটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো সংগঠনে মানুষের আচরণ নির্ভর করে তার আবেগ, অনুভূতি, মেজাজ, সংবেদনশীলতা, মনোভাব, প্রেষণা, দ্বন্দ্ব বা হতাশা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি তারা নানাভাবে সাড়া দিয়ে থাকে যা সংগঠনের পক্ষে-বিপক্ষে যেতে পারে। তাই তাদের আচরণকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক উপাদানসমূহ

Key Elements of Organizational Behavior

সংগঠনের মানুষের আচরণ কতিপয় উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ আচরণ সঠিকভাবে বুঝতে হলে এর উপাদানগুলো সম্পর্কে জানা আবশ্যক। সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক উপাদানগুলো Keith Davis এবং Newstorm একটি চিত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেনঃ

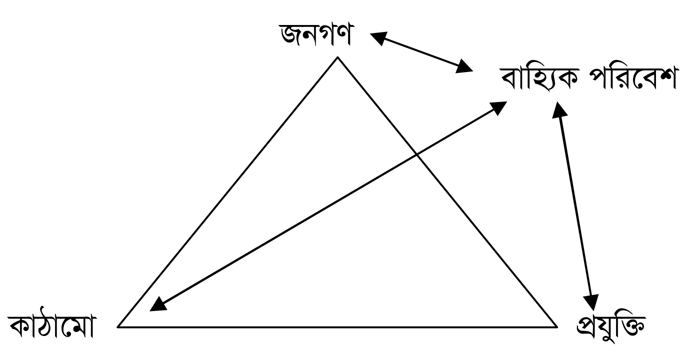

চিত্রঃ সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক উপাদানসমূহ

[উৎসঃ Keith Davis and John W. Newstrom, organizational Behavior: Human Behavior at Work, McGraw-Hill, 2016]

নিম্নে প্রধান উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

১. মানুষ (People): মানুষবিহীন কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারেনা, সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে মানুষের ভূমিকাই অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সংগঠনে 'মানুষ' বলতে কর্মরত ব্যক্তি, দল, উপদল এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়। এ মানুষগুলো সচেতনভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। তাদের কামনা-বাসনা ও প্রত্যাশার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে কর্ম পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়। অনুকূল পরিবেশ সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মীদের লক্ষ্য যুগপৎভাবে অর্জন করতে সাহায্য করে।

২. কর্ম (Job and Task): দক্ষ ও ফলপ্রসূভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য কর্ম বিভাজনের সৃষ্টি। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সঠিকভাবে অর্জনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মে বিভক্ত করে উপযুক্ত ব্যক্তি বা দলকে সে সব কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়। দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন করতে হলে কর্ম বিশ্লেষণ (Job analysis) করে কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করা আবশ্যক। কর্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কাজকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি এবং দ্রুততার সাথে কর্মসম্পাদন করতে হলে কর্মচারীদের কিরূপ আচরণ করা প্রয়োজন তা নিরূপণও করতে পারি।

৩. কাঠামো (Structure): সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের নির্বাহীগণের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এটা নির্বাহীদের ক্ষমতা, সীমারেখা এবং তাদের উপর ন্যস্ত কার্যাবলি ও পদমর্যাদা নির্দেশ করে। স্বাভাবিকভাবেই এর মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, কর্মসম্পাদনের জন্য কে কার নিকট দায়ী। সংগঠনে কাঠামো দুই ধরণের সম্পর্ক তুলে ধরে, যথাঃ উল্লম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal)। ক্ষমতা যখন উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন তাকে উল্লম্ব সম্পর্ক বলে। অন্যদিকে, একই পদমর্যাদা সম্পন্ন বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে অনুভূমিক সম্পর্ক বলে। বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো, টেকনিক্যাল দিক এবং সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে ব্যবস্থাপকদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো নির্বাচন সহজতর হয়।

৪. প্রক্রিয়া (Process): ব্যবস্থাপকগণ কীভাবে এবং কোন পন্থায় কার্য সম্পাদন করবেন তা সংগঠনের কাঠামোর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন ব্যবস্থাপকীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের উপায়, প্রয়োজনীয় প্রেষণা ও সুস্পষ্ট নির্দেশনার উল্লেখ থাকে। কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

৫. সাংগঠনিক পরিবেশ (Organizational Environment): প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরাজমান সামগ্রিক অবস্থাকে সাংগঠনিক পরিবেশ বা অভ্যন্তরীন পরিবেশ বলে, যেখানে সকল কর্মী তাদের কর্তব্য ও কর্মসম্পাদন করে। এ পরিবেশের উপাদানের মধ্যে মালিকপক্ষ, শেয়ারহোল্ডার, কর্মচারী এবং পরিচালক পর্ষদ অন্তর্ভুক্ত। এসব উপাদান প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ এরা খুব কাছে থেকে ব্যবস্থাপনার কার্যকে অবলোকন করে। এ পরিবেশ যত কর্মী অনুকূল ততই সংগঠনে গতিশীলতা বাড়ে।

৬. বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment): বাহ্যিক পরিবেশ বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝায়। এ পরিবেশ দুভাগে বিভক্তঃ ***(ক) সাধারণ পরিবেশ এবং (খ) কার্য পরিবেশ***। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থা/শক্তিসমূহ প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে সেগুলো দ্বারা সৃষ্টি হয় সাধারণ পরিবেশের। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিবেশের উপাদানগুলো হলো- অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত এবং আন্তর্জাতিক। পক্ষান্তরে, কার্য পরিবেশ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগোষ্ঠী বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত। অনুকূল সাংগঠনিক পরিবেশ বজায় রাখতে হলে পরিবর্তনশীল বাহ্যিক পরিবেশের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সবসময় সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭. প্রযুক্তি (Technology): কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মান নির্ভর করে সঠিক প্রযুক্তি ও তার ব্যবহারের উপর। কর্মীরা শুধুমাত্র তাদের হাত ব্যবহারের মাধ্যমে সকল কাজ সম্পাদন করতে পারেনা। যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত কার্য সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতিও অনেকাংশে নির্ধারিত হয়ে যায়। প্রযুক্তির ব্যবহার সংগঠনে মানবীয় সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। মনে রাখা দরকার, প্রযুক্তির অতি ব্যবহারের কারণে মানবীয় সম্পর্কের অবনতিও হতে পারে। প্রযুক্তি শুধুমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি বা কৌশলকেই পরিবর্তন করে না, এর প্রভাবে আমাদের পুরো জীবন-স্বভাবই বদলে যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

আচরণ বিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে সাংগঠনিক আচরণ, যার উদ্ভব মূলত: বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠা। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক বা কর্মীকে যন্ত্র মনে করা হতো। সাংগঠনিক আচরণ সব বিষয়ের সারমর্ম। সাংগঠনিক আচরণ শুধু সংগঠনেই নয় আমাদের বাস্তব জীবনেও প্রভাব ফেলে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সংগঠনে কর্মীর আচরণও খুব বেশি মূল্যায়িত হচ্ছে। সংগঠনের আকার যত বাড়ছে সাংগঠনিক আচরণের গুরুত্বও তত বাড়ছে। সাধারণ কর্মীদের আচরণগত সমস্যার কারণেও সংগঠন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এ জন্য যেসব উপাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আচরণ প্রভাবিত হয় তা সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের সজাগ থাকতে হবে।

পাঠ ১.২ সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক ধারণাসমূহ
Fundamental Concepts of Organizational Behavior

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সংগঠনের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

সংগঠনে মানুষের আচরণ কিছু মৌলিক ধারণার উপর নির্ভর করে। প্রত্যক মানুষেরই সবকিছুর পেছনে তার নিজস্ব কিছু দর্শন রয়েছে। সাংগঠনিক আচরণ শাস্ত্রেও তেমনি কিছু দর্শন রয়েছে, যা দুইভাগে বিভক্ত:

(ক) মানুষের প্রকৃতি (The nature of people)

(খ) সংগঠনের প্রকৃতি (The nature of organizations)

নিম্নে দর্শনগুলো আলোচনা করা হল:

ক. মানুষের প্রকৃতি
The nature of people

মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে চারটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে:

১. ব্যক্তিগত পার্থক্য (Individual Differences): একটি সংগঠনে কর্মরত সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে সামগ্রিকভাবে মতের মিল খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ। এ কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আলাদা মানদণ্ডে বিচার করা উচিত। ব্যক্তিগত পার্থক্যের ধারণাটি মূলত ব্যক্তির মনস্তত্বের উপর নির্ভর করে। এক ব্যক্তির সাথে আরেক ব্যক্তির সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, ধর্ম ইত্যাদি মিল থাকতে পারে; কিন্তু তার মনস্তাত্বিক ভিন্নতার (যেমন: ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, প্রত্যক্ষণ, শিক্ষণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি) কারণে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য স্বাভাবিক ভাবেই থাকতে পারে। একে এককথায় ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি (Law of Individual Differences) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি (A Whole Person): এ ধারণাতত্ত্বে বলা হয়েছে, সংগঠনের প্রত্যেক কর্মীকে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ব্যক্তিকে তার মেধা, বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা থেকে আলাদা করা যায়না। মানুষের বিভিন্ন গুণকে বিভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে মানুষকে সবকিছুর সমন্বয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ব্যক্তির দাম্পত্যজীবন, কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি মানুষ তার নৈপূণ্য, মেধা, শারিরীক ও মানসিক সব অবস্থা মিলিয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

৩. প্রেষিত আচরণ (Motivated Behavior): আমরা আগেই জেনেছি মানুষ বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম আচরণ করে। তার মধ্যে ব্যক্তির চাহিদা পূরণের তাগিদ অন্যতম। সংগঠনের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রেষণা অনস্বীকার্য। যেমন- কর্মীদের দিয়ে যদি অতিরিক্ত সময় কাজ করাতে হয় তাহলে তাদের প্রেষণা দানের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

৪. মূল্যবোধ (Values)ঃ প্রত্যেক মানুষেরই জন্মের পর থেকে বয়সের বিভিন্ন ধাপে তার নিজস্ব কিছু মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা ব্যক্তি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাই ইচ্ছে করলেই তাকে দিয়ে যে কোনো কাজ করানো সম্ভব হয় না। তাই তার মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে ব্যবসায়ের অন্যান্য উপাদানের মধ্যকার পার্থক্য বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

খ. সংগঠনের প্রকৃতি

The Nature of organization

সংগঠনের প্রকৃতি সংক্রান্ত দুইটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে:

১. সামাজিক ব্যবস্থা (Social System): প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সমাজের একটি অংশ, এ কারণে প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রম সমাজের রীতিনীতি ও অন্যান্য সামাজিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি মানুষও সমাজের বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে তার মনস্তাত্বিক, সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই অর্জন করার চেষ্টা করে।

সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দেশে যেসব বিদেশী প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে, তারা তাদের সামাজিক ব্যবস্থাকে অনুসরণ না করে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে অনুসরণ করেই তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এর মূল কারণই হচ্ছে সংগঠন ও সামাজিক ব্যবস্থা যা একে অপরকে প্রভাবিত করে।

২. পারস্পরিক স্বার্থ (Natural Interest): প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠী ও তার নিজের স্বার্থ নিয়ে, অর্থাৎ পারস্পরিক স্বার্থ নিয়েই সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীরা সংগঠনকে সহায়তা করে, তেমনি সংগঠন ও কর্মীদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সদা সচেষ্ট থাকে। অর্থাৎ সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের ও কর্মীদের লক্ষ্য অর্জনে পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে অভিন্ন ধারণা পোষণ করা।

সারসংক্ষেপ

সংগঠনে মানুষের আচরণ কিছু মৌলিক ধারণার উপর নির্ভর করে। প্রত্যক মানুষেরই সবকিছুর পেছনে তার নিজস্ব কিছু দর্শন রয়েছে। সাংগঠনিক আচরণ শাস্ত্রেও তেমনি কিছু দর্শন রয়েছে, যা দুইভাগে বিভক্ত: মানুষের প্রকৃতি এবং সংগঠনের প্রকৃতি। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে চারটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে, যথা- ব্যক্তিগত পার্থক্য, পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি, প্রেষিত আচরণ এবং মূল্যবোধ। অন্যদিকে, সংগঠনের প্রকৃতি সংক্রান্ত দুইটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে, যথা- সামাজিক ব্যবস্থা এবং পারস্পরিক স্বার্থ। ব্যবস্থাপকদের এ দুটি দর্শন ভালভাবে বুঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি দর্শনের অন্তর্গত উপাদানগুলো বিভিন্নভাবে কর্মীর আচরণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

পাঠ ১.৩ ব্যবস্থাপকীয় ভূমিকা, দক্ষতা ও কার্যাবলি
Managerial Roles, Skills and Functions

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বর্ণনা বলতে পারবেন।

ব্যবস্থাপক যদি তার ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ থাকে, তার দক্ষতা থাকে এবং ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে, তাহলে কর্মীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কর্মচঞ্চল কর্মী মানেই সুখী কর্মী ও উৎপাদনক্ষম কর্মী, ফলাফল- অধিক উৎপাদন। এ থেকে এটা পরিষ্কার, সংগঠনে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা, তার দক্ষতা ও কার্যাবলির উপর কর্মীদের আচরণ অনেকাংশে নির্ভর করে। এ পাঠে এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ব্যবস্থাপকীয় ভূমিকা
Managerial Roles

একজন ব্যবস্থাপক যে স্তরেই কাজ করুক না কেন, তাকে কিছু মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। ম্যালগিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হেনরি মিন্‌জবার্গ (Henry Mintzberg) একটি গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বা ভূমিকাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এ পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্যবস্থাপক বাস্তবে যা করেন তা পর্যবেক্ষণ করা এবং এ পর্যবেক্ষনলব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি বা ভূমিকা কী কী হতে পারে সে সম্পর্কে উপসংহারে আসা।

চিত্র: ব্যবস্থাপকের ভূমিকা

বিভিন্ন সংগঠনের পাঁচজন প্রধান কার্য নির্বাহীর কার্যকলাপের উপর সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে সমীক্ষা চালিয়ে হেনরি মিন্‌জবার্গ দেখেছেন যে, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ - এ চিরাচরিত শ্রেণিবিন্যাসকৃত কার্যাবলির বাইরেও আরো বহুবিধ কাজে ব্যবস্থাপকগণ জড়িত থাকেন। বিভিন্ন কার্যাবলিকে তিনি তিনটি মুখ্য ভূমিকাভুক্ত কাজে বিভক্ত করেছেন:

ক. আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা: এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক তিন ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিভাবকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড সম্পাদন, নেতৃত্বের ভূমিকা এবং সংযোগ রক্ষাকারী ভূমিকা।
খ. তথ্যমূলক ভূমিকা: এখানেও ব্যবস্থাপক তিন ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তথ্য গ্রহণকারীর ভূমিকায় একটি প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ, তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকায় অধীনস্থদের নিকট তথ্য সরবরাহকরণ এবং মুখপাত্রের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠানের বাইরের লোকজনের নিকট তথ্য প্রদান।

গ. সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা: সর্বশেষ, মিন্‌জবার্গ চারটি ভূমিকা চিহ্নিত করেছিলেন। উদ্যোক্তার ভূমিকা, বিশৃংখলা নিরোধকারীর ভূমিকা, সম্পদ বণ্টনকারীর ভূমিকা এবং মধ্যস্থকারীর ভূমিকা।

বিভিন্ন ভূমিকায় একজন ব্যবস্থাপক যেসব কার্য সম্পাদন করেন তা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

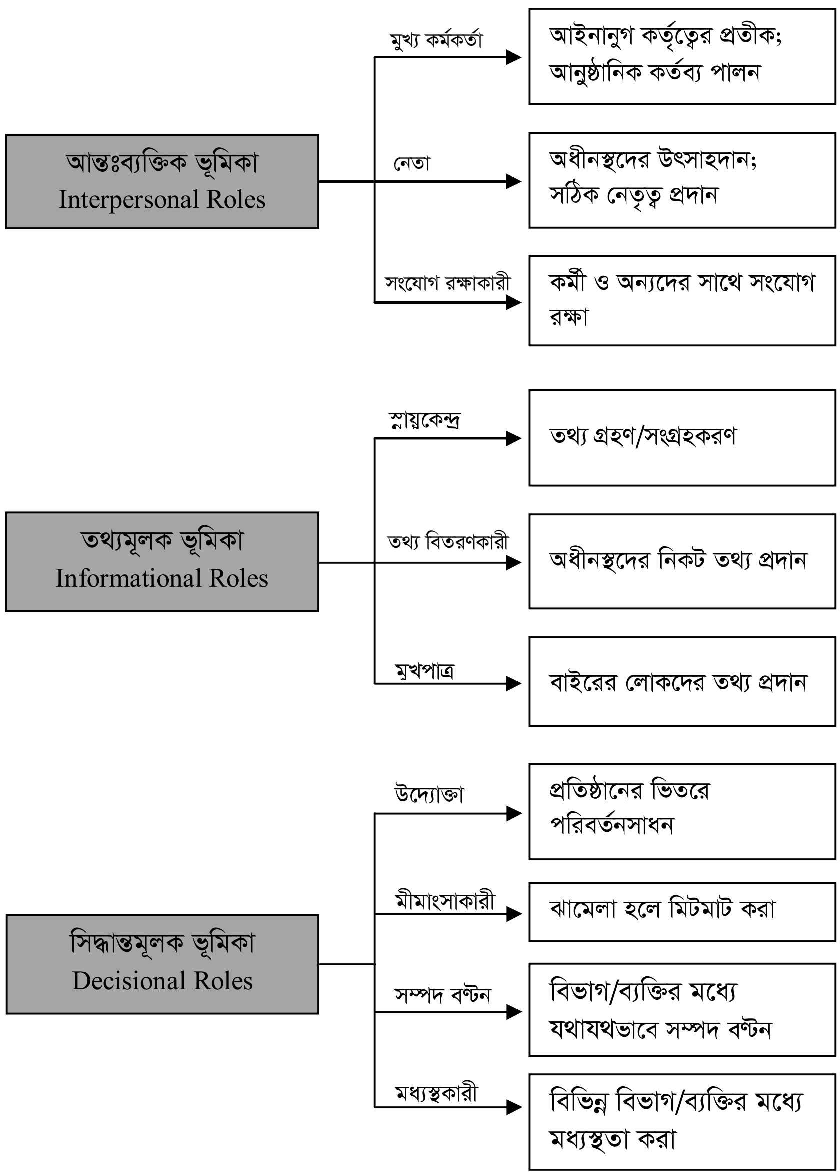

চিত্র: বিভিন্ন ভূমিকায় একজন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি

ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা

Managerial Skills

ব্যবসায় ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্য যেকোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, একজন সফল ব্যবস্থাপকের কতিপয় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে নেতৃত্বের সফলতার জন্য চার প্রকার দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। ব্যবস্থাপকের সাফল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহ পরের পাতায় চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

চিত্র: ব্যবস্থাপকের বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা।

১. কারিগরি দক্ষতা (Technical Skills): কারিগরি দক্ষতা বলতে ব্যক্তির যে কোনো ধরনের প্রক্রিয়া বা কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান বা যোগ্যতাকে (ability) বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ, হিসাব বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, টাইপিস্ট এবং ছুতারের কথা বলা যায়। এসব পেশাদার ব্যক্তিদের অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কারিগরি দক্ষতা বলা হয়। এ দক্ষতাগুলো অপারেটিং লেভেলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনার সর্বনিম্ন পর্যায়ে এ ধরনের দক্ষতা অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু নিচের লেভেলের কর্মীরা যদি নেতৃত্বে আসে তাহলে এ ধরনের দক্ষতা সাধারণত খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। কোনো কর্মী পদোন্নতি পেয়ে উপরের পদে আরোহণ করতে থাকলে এ ধরনের দক্ষতার গুরুত্ব তখন ক্রমশ কমতে থাকে এবং অন্যান্য দক্ষতাগুলোর প্রয়োজন বেড়ে যায়।

২. মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা (Human Relations Skills): এ ধরনের দক্ষতা বলতে, লোকের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করার এবং দলগত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতাকে বুঝায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারী, কর্মকর্তা ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির লোক যৌথভাবে লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত থাকে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে নিম্নপদস্থ লোকদের মধ্যকার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থাপককে যোগাযোগে দক্ষ হতে হয়। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য এ ধরনের দক্ষতা খুবই প্রয়োজন। এ ধরনের দক্ষতা ছাড়া কোনো ব্যবস্থাপকের পক্ষেই সফলতার সাথে কার্যনির্বাহ করা সম্ভব নয়।

৩. অনুধাবন দক্ষতা (Conceptual Skills): একজন ব্যবস্থাপকের সাংগঠনিক বিষয়াদির বিভিন্ন দিক সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাই হলো তার অনুধাবন দক্ষতা। এরূপ দক্ষতা ব্যবস্থাপকের চিন্তন-শক্তির (thinking ability) উপর নির্ভর করে। ব্যবস্থাপকের এমন ধরনের মানসিক ক্ষমতা থাকা দরকার যা দিয়ে তিনি বুঝতে পারেন সংগঠনের কার্যকলাপ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, বহির্জগতের সাথে সংগঠনের সম্পর্ক কিরূপ থাকা প্রয়োজন এবং বর্তমানে কিরূপ

আছে, সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কীভাবে। সোজা কথায়, সংগঠনকে সার্বিকভাবে বুঝার ক্ষমতাই অনুধাবন ক্ষমতা।

৪. সমস্যা নির্ণায়ন ক্ষমতা (Diagnostic Skills): ডাক্তার যেমন রোগীর লক্ষণ বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করেন, তেমনি একজন ব্যবস্থাপককেও প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি বিশ্লেষণ করে সমস্যার সমাধান দিতে হয়। তাই ব্যবস্থাপকের সমস্যা নির্ণায়ন ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে ব্যবস্থাপকের দক্ষতার মিশ্রণ (Skill-mix) কিরূপ হয়ে থাকে তা ব্যবস্থাপকের দক্ষতাসমূহ এবং স্তরভেদে দক্ষতার মিশ্রণ চিত্রে (পরের পাতা লক্ষ করুন) দেখানো হয়েছে। সব স্তরের ব্যবস্থাপকের মধ্যে চারটি দক্ষতার সবগুলো সমানভাবে থাকে না (বা থাকার দরকার নেই)। সব স্তরের জন্য সবগুলো গুরুত্বপূর্ণও নয়। যেমন- নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপকেরা কারিগরি ও মানবীয়/আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার উপর বেশি নির্ভর করেন এবং অনুধাবন দক্ষতা ও সমস্যা-নির্ণায়ন দক্ষতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

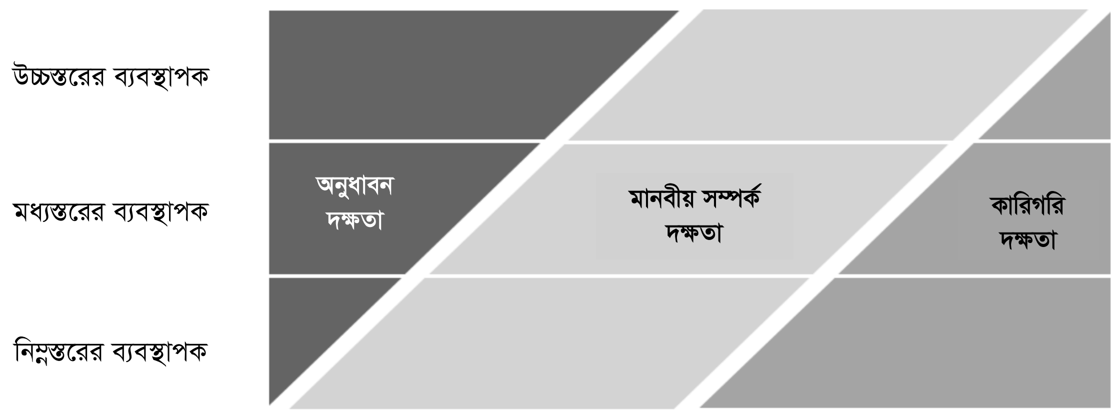

চিত্র: ব্যবস্থাপকের দক্ষতাসমূহ এবং স্তরভেদে দক্ষতার মিশ্রণ।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

Functions of Management

যদিও ব্যবস্থাপকেরা বহু রকমের কাজ করে থাকেন, তাদের কাজগুলোকে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গণ্ডিবদ্ধ করে প্রধানত চারটি প্রধান কার্যাবলিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ চারটি প্রধান কার্যাবলির ভেতরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বা মিল-থাকা কার্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ চারটি ব্যবস্থাপকীয় কাজ হলো: পরিকল্পন, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ। উক্ত কাজগুলোর প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থাপনাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনীর কর্ম-প্রচেষ্টা এবং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত পরিকল্পন, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই হলো ব্যবস্থাপনা।

সাধারণভাবে "প্রক্রিয়া" (process) হলো, কোন কাজ করার সুসংবদ্ধ উপায় (systematic way of doing thing)। ব্যবস্থাপনাকে প্রক্রিয়া বলা হয় এজন্য যে, সব ব্যবস্থাপকই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কাজে নিয়োজিত থাকেন।

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উপাদানগুলোই ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি। ইদানিংকালে ব্যবস্থাপনার প্রথম কার্য 'পরিকল্পন'- এর সাথে ব্যবস্থাপনা-বিশারদগণ 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ'-কেও একসঙ্গে ব্যবহারের পক্ষপাতি। তদানুযায়ী, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উপাদানসমূহ/ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যাবলি পরের পাতায় চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

(১) পরিকল্পন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ (Planning and Decision Making)ঃ সহজভাবে বলা যায়, পরিকল্পন মানে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমালা প্রণয়ন এবং এগুলো অর্জনের জন্য সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণ। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো, পরিকল্পন প্রক্রিয়ার অংশ। কতিপয় বিকল্প কর্মপন্থার মধ্য থেকে একটি পন্থা নির্বাচন করার সাথে সিদ্ধান্তগ্রহণ জড়িত। পরিকল্পন ও সিদ্ধান্ত ভবিষ্যত-কার্যাবলির পথ-নির্দেশ হিসেবে কাজ করে এবং ব্যবস্থাপকীয় ফলপ্রসূতা বা দক্ষতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। পরিকল্পন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনা ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করে এবং যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহার করে; কর্মীরা নির্বাচিত লক্ষ্য ও কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে কর্ম সম্পাদন করে; এবং লক্ষ্যার্জনের অগ্রগতি পরিমাপ ও মনিটরিং করা হয় যাতে প্রয়োজনবোধে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

পরিকল্পন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্য (goals/objectives) নির্ধারণ করা। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ ও সেকশনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এরপর লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে সুশৃংখল উপায়ে লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মসূচি (programs) নির্ধারণ করা হয়।

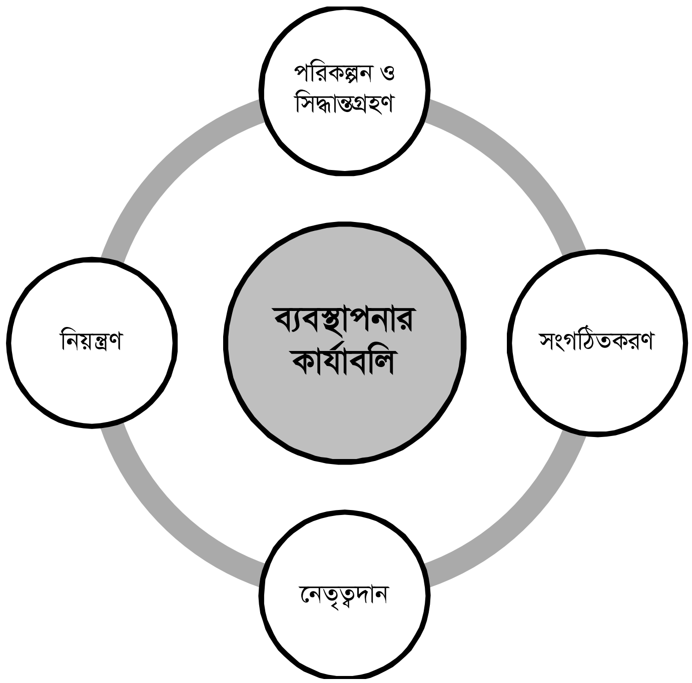

চিত্রঃ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার আন্ত:ক্রিয়াশীল প্রকৃতি

(২) সংগঠিতকরণ (Organizing): পরিকল্পনের পরই সংগঠিতকরণের কাজ শুরু। সংগঠিতকরণ (কেউ কেউ 'সংগঠন' বলে থাকে) হলো কর্মীদের মধ্যে কাজ বন্টন করা, বিভিন্ন কাজকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রুপিং করা, সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করা এবং কর্তৃত্ব ও রিপোর্টিং সম্পর্ক নির্ধারণ করা, কর্মী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি। কর্মী-সংস্থান (staffing) সংগঠিতকরণেরই একটি অংশ, যদিও কোনো কোনো গ্রন্থকার কর্মী-সংস্থানকে আলাদা কার্য হিসেবে দেখিয়েছেন।

(৩) নেতৃত্বদান (Leading): প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও কার্যাবলি সংগঠিত করার পর পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মসম্পাদনের জন্য কর্মীদেরকে নেতৃত্ব দেয়া অপরিহার্য। সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা ও সর্বোত্তম সম্পদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন যদি সেগুলো বাস্তবায়ন ও ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত নেতৃত্ব দেয়া না যায়। কর্মীদেরকে পরিচালনা করা, তাদেরকে প্রভাবিত করা এবং তাদের মধ্যে কাজ করার আগ্রহকে উদ্দীপিত করা (অর্থাৎ প্রেষণাদান) ইত্যাদি নেতৃত্বদানের অন্তর্ভুক্ত। একেকজন ব্যবস্থাপককে একেকজন নেতা হিসেবে তার অধীনস্থদের পরিচালিত করতে হয়। নেতা হিসেবে

ব্যবস্থাপক কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করেন, নেতৃত্ব দেন, তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং তাদের প্রেষণার ব্যবস্থা করেন।

(৪) নিয়ন্ত্রণ (Controlling)ঃ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হলো নিয়ন্ত্রণ। ব্যবস্থাপক প্রথম ধাপে প্রণীত পরিকল্পনার আলোকে কর্মীদেরকে যেসব কার্য সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ দেন সেগুলো তারা সঠিকভাবে করছে কী-না মূলত তা দেখাই হলো নিয়ন্ত্রণ। কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করা নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট সময়েও পরিকল্পিত পন্থায় পূর্ব-নির্ধারিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কর্মীদের কর্মকাণ্ড ও সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণকালে সমস্যা ধরা পড়লে সাথে সাথে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থাপনায় বহু রকমের পরিবর্তন এসেছে। প্রতিষ্ঠানের আয়তন বেড়েছে, কর্মী সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করছে, এক দেশের প্রতিষ্ঠান অন্যান্য দেশে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদেরকেও বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তাই বর্তমান যুগের জটিল এবং গতিশীল পরিবেশে ব্যবস্থাপকদেরকে সদাসর্বদা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এ জটিল এবং গতিশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হলে ব্যবস্থাপকদের যেমন দক্ষ হতে হবে তেমনি তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপক যদি তার ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ থাকে, তার দক্ষতা থাকে এবং ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে, তাহলে কর্মীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একজন ব্যবস্থাপক যে স্তরেই কাজ করুক না কেন, তাকে কিছু মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। ব্যবস্থাপক বাস্তবে যা করেন তা পর্যবেক্ষণ করা এবং এ পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি বা ভূমিকা কী কী হতে পারে সে সম্পর্কে উপসংহারে আসা। আবার, ব্যবসায় ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, একজন সফল ব্যবস্থাপকের কতিপয় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপকের সফলতার জন্য চার প্রকার দক্ষতা থাকা অপরিহার্য- কারিগরি দক্ষতা, মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা, অনুধাবন দক্ষতা এবং সমস্যা নির্ণায়ন ক্ষমতা। দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ব্যবস্থাপকেরা বহু রকমের কাজ করে থাকেন, তাদের কাজগুলোকে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গণ্ডিবদ্ধ করে প্রধানত চারটি প্রধান কার্যাবলিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে: পরিকল্পন, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. "একজন ব্যবস্থাপক যে স্তরেই কাজ করুন না কেন, তাকে কিছু মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়।" ব্যবস্থাপকের বিভিন্ন ভূমিকার প্রেক্ষাপটে উক্তিটির যথার্থতা আলোচনা করুন।
২. সংগঠনকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী কী?
৩. আপনি কীভাবে সাংগঠনিক আচরণকে সংজ্ঞায়িত করবেন? সাংগঠনিক উদ্দেশ্য কীভাবে সাংগঠনিক আচরণকে প্রভাবিত করে? আলোচনা করুন।
৪. সাংগঠনিক আচরণ অধ্যয়নের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৫. 'সংগঠন' ও 'আচরণ' - এ দু'টি তত্ত্ব আলোচনা করুন। সাংগঠনিক আচণের মৌলিক উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।
৬. সাংগঠনিক আচণের মৌলিক ধারণাগুলো কেন আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন? ধারণাগুলো বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।
৭. একজন ব্যবস্থাপকের কী কী দক্ষতা থাকা প্রয়োজন? কেন?
৮. ব্যবস্থাপকদের মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা এবং অনুধাবন দক্ষতার মর্মকথা কী?
৯. বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার মিশ্রণ সাধারণত কিরূপ হয়ে থাকে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।
১০. প্রক্রিয়া কী? ব্যবস্থাপনাকে কেন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়? ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার আন্ত:ক্রিয়াশীল প্রকৃতি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।
১১. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি কি কি? সংক্ষেপে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা করুন।